রবীন্দ্র সংস্পর্শে

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার

ও

রমা কর

প্রণতি মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

শান্তিনিকেতনে বোধহয় অনেকেরই ধারণা ছিল সন্তোষচন্দ্র মজুমদার রবীন্দ্রনাথের পালিত পুত্র। এলম্‌হার্স্ট্‌ লিখেছেন সেখানে তিনি যখন প্রথম এলেন, রবীন্দ্রনাথের ছেলে রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আলাপ হল এবং তাঁর পালিত ছেলে সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গেও। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যখন সবে পড়াশোনা আরম্ভ হয়েছে, সন্তোষচন্দ্র তখন এসে এনট্রেন্স ক্লাসে ভরতি হয়েছিলেন। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০২ সালে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকর্মে যোগ দেন। তিনি লিখেছেন সন্তোষচন্দ্র মজুমদার এই বৎসরের প্রবেশিকা বর্গের ছাত্র— রথীন্দ্রনাথের সহপাঠী। সেই যে এলেন সন্তোষচন্দ্র বাঁধা পড়লেন চিরকালের মতো। নিজের কথা কিছু লেখেননি তিনি, তবু সাক্ষ্য প্রমাণের অপেক্ষায় না থেকে একথা বলা যায় যে, শান্তিনিকেতন তাঁকে লালন করেছিল, তাঁকে প্রাণিত করেছিল। এই তাঁর শিক্ষাভূমি, তাঁর কর্মভূমি। ছাত্রাবস্থা থেকেই এর ছোটো-বড়ো সব কাজের সঙ্গে তাঁর মন জড়ানো। সে মনের উপরে তাঁর শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথের একচ্ছত্র আধিপত্য। রবীন্দ্রনাথেরও নির্ভরতার স্থান সন্তোষচন্দ্র, প্রত্যাশারও। প্রত্যাশা ব্যক্তিগত কোনো ইচ্ছা- অনিচ্ছাকেন্দ্রিক বড়ো একটা নয়, প্রত্যাশা মুখ্যত আশ্রম নিয়ে, বিদ্যালয়ের পরিবেশ রক্ষার ভাবনা, মঙ্গল-অমঙ্গল, তার আদর্শ রক্ষা ইত্যাদি নিয়ে। এইসব নিয়ে আশার কথা, সম্ভাবনার কথা শোনায় তাঁর চিঠি, আরো উদ্যম আরো চেষ্টা দাবি করে, সফলতার মাত্রা নিয়ে অনুযোগ করে কখনও বা। তাবলে, তাঁর চিঠিপত্রে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ যে নেই তা নয়, তাও আছে। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিও কখনও চিঠির বিষয় হয়ে ওঠে।

যাঁদের নিয়ে কাজ করতেন রবীন্দ্রনাথ, সাধারণত তাঁদের স্বভাবের দোষগুণ ভালো করেই জানতেন। অল্প বয়স থেকে কাছে পাওয়া সন্তোষচন্দ্রকে তেমন করেই জানতেন, তাঁর স্বভাবের কিছুই অবিদিত ছিল না। তাঁকে লেখা চিঠিতে প্রয়োজনের কথাই বেশি। আর রবীন্দ্রনাথের চিঠির যেমন ধরন, চিঠির উপলক্ষ্য অনেক সময়ই নিজের সীমানা নিজেই পার হয়ে চলে যায়। একবার তিনি বিদেশ থেকে সন্তোষচন্দ্রকে ৭ পৌষ যে চিঠি লিখেছিলেন, তার শুরুতে পরদিন ৮ পৌষের ভাবটাই তাঁর মনকে অধিকার করেছিল, সেদিন পুরোনো ছাত্রদের পুনর্মিলনের দিন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘এই আটই পৌষে তোমার কথা বিশেষ করে মনে হয় কেননা এই দিন আমাদের প্রাক্তন ছাত্রদের দিন—ওই দিনের দিনপতি হচ্চ তুমি। তাই আমি এখান থেকে তোমাকে স্মরণ করে আমার আশীর্বাদ পাঠাচ্চি। আজকের দিনে তোমাদের উৎসাহে যোগ দিতে না পারা আমার পক্ষে বড়ো দুঃখের। আমার হৃদয়

আজ কেবলি তোমাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্চে তোমাদের শাল বাগানে, তোমাদের ছাতিমতলায় তোমাদের মন্দিরে।'

সন্তোষচন্দ্রের ছোটো জীবনটি শান্তিনিকেতনের ছোটো সীমার মধ্যেই আবর্তিত হয়েছে। তার কাজের মধ্যেই ছিলেন, এমন সময় মৃত্যু এসে ছেদ টেনে দিল। বয়স তখন তাঁর সবে চল্লিশ বছর পার হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যখন সে খবর পেলেন, তিনি তখন বিদেশে। ১৯২৬ সাল। *পথে ও পথের প্রান্তে*-র কয়েকটি চিঠিতে সন্তোষচন্দ্রের প্রসঙ্গ আছে। প্রথম যে চিঠিতে সন্তোষচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কয়েকটি কথা লিখেছিলেন, কেমন বিহ্বল শুনিয়েছিল তাঁর কণ্ঠ। কদিন পরে আর এক চিঠিতে সন্তোষচন্দ্রের 'শ্রদ্ধাপ্রদীপ্ত জীবনের' কথা বললেন। বললেন সন্তোষচন্দ্রকে তিনি প্রমাণের দ্বারা নয়, সম্পূর্ণ দৃষ্টির দ্বারা জানেন, ভালোবাসার দ্বারা জানেন। ওই চিঠিতেই বলেছিলেন 'তার সংসার এবং তার সাধনা, তার কর্ম এবং আদর্শ একত্র মিলিত ছিল, তার অল্পকালের আয়ুটুকু নিয়ে সে যে তারি মধ্যে জীবনযাপন করে যেতে পেরেছে এ তার সৌভাগ্য।' হবে হয়তো তাই। সন্তোষচন্দ্র তাঁর কর্মের আদর্শ ও সংসারের বাস্তবতার মধ্য দিয়ে সার্থক জীবন যাপন করেছিলেন, সে তাঁর সৌভাগ্য। তবু তাঁর কথা বলতে গিয়ে স্মরণে আসে রবীন্দ্রনাথের একটি বহুদিনের পুরানো কবিতার কয়েকটি ছত্র :

ওই দেখো না পুরিতে আশ
মরণ করিল কারে গ্রাস।
নিশি না হইতে সারা খসিয়া পড়িল তারা,
রাখিয়া গেল না ইতিহাস।

— কবির প্রতি নিবেদন। *মানসী*

রবীন্দ্রনাথের নবরত্ন সভায় সন্তোষচন্দ্রের সন্ধান মিলবে না, কিন্তু তাঁদের মতো শিক্ষক কর্মসংগঠককে পাশে পেয়েছিলেন বলেই এই বিদ্যালয়-সংকল্পের বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব হয়েছিল। এই গ্রন্থের বিষয় শান্তিনিকেতন আশ্রম-বিদ্যালয়ের অন্যতম কারিগর সেই মানুষটি।

আর 'রমা কবির সৃষ্টিলীলা প্রাঙ্গণে সুরলোকের দূতী' নামে একটি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত হল এই গ্রন্থে। রমা হলেন রমা মজুমদার (কর), সন্তোষচন্দ্রের সহোদরা। তিনিও শান্তিনিকেতনে মানুষ, অসামান্য ছিল তাঁর সংগীত-কণ্ঠ। একটা সময় রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল তাঁর গানের যে বিপুল ভাণ্ডার সঞ্চিত হয়ে আছে রমার অন্তরে, বিয়ের পরে সে যদি দূরে কোথাও চলে যায়, তাঁর গান আলো-নেভা প্রদীপের মতো পড়ে থাকবে। বিবাহসূত্রে দূরে গেলেন না রমা, ক'বছর না যেতে দূরেই গেলেন তবু। সে চিরদূরত্বের দেশে স্মৃতিই শুধু তাঁর নাগাল পেতে পারে।

সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের পাঁচ পুত্র। পিতার মৃত্যুর সময় তাঁরা সকলেই ছোটো ছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র সুবীরচন্দ্র মজুমদার তখনও ভূমিষ্ঠ হননি। তিনি শান্তিনিকেতনে পাঠভবনের

শিক্ষক ছিলেন। আমার পরিচয় ছিল তাঁর সঙ্গে, এমন সহজ ও অমায়িক স্বভাবের মানুষ সংসারে কমই দেখা যায়। সন্তোষচন্দ্রের পরিবার সম্ভবত তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি ও সংগ্রহভুক্ত অন্য যা কিছু মূল্যবান জিনিস তাঁদের কাছে ছিল অনেক আগেই সেসব বিশ্বভারতীর রবীন্দ্র-আর্কাইভ্‌সে প্রদান করেছিলেন। সুবীরবাবুর কাছে সন্তোষচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলির বেশ কিছু প্রতিলিপি, সন্তোষচন্দ্রের লেখা কয়েকটি চিঠি ইত্যাদি এবং দু-একটি অন্য কাগজপত্র দেখেছিলাম। তাঁদের কাছে এগুলি ছিল অমূল্য পিতৃস্মৃতি, পরম মমতায় এগুলি তাঁরা তাঁদের সংগ্রহে রেখেছিলেন।

২৫ মে ১৯৮৬ টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে সন্তোষচন্দ্র মজুমদার শতবার্ষিকী সভা হয়েছিল। প্রধান দুই বক্তা ছিলেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন দুই অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দ্বিতীয় জন সন্তোষচন্দ্রের ছাত্রও ছিলেন। দুই বক্তার ভাষণে সে যুগের আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রেক্ষাপটে সন্তোষচন্দ্রের জীবন ও কর্মের ছবিটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই দুটি ভাষণ বর্তমান গ্রন্থে আমরা সংকলন করেছি। সন্তোষচন্দ্রের মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কয়েকটি চিঠিতে যা বলেছিলেন, যা বলেছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসীতে, সেগুলি এ গ্রন্থে রইল। শান্তিনিকেতনের অনেক স্মৃতিকথায় সন্তোষচন্দ্রের কথা আছে, তার মধ্যে থেকে শুধুমাত্র প্রমথনাথ বিশীর *রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন* গ্রন্থের লেখাটি এবং সুধীরঞ্জন দাশের *আমাদের শান্তিনিকেতন* গ্রন্থের লেখার অংশ বেছে নিয়েছি। Visva Bharati পত্রিকায় ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. আর্থার সীমুরের (Dr. Arthur Seymour) স্ত্রী Mayce F Seymour-এর একটি স্মৃতিচারণমূলক রচনা মুদ্রিত হয়েছিল। বর্তমান গ্রন্থে জীবনী অংশে সেই স্মৃতিকথার বিষয়বস্তু অনেকটাই ব্যবহৃত হয়েছে।

অনেকদিন আগে, সেই সন্তোষচন্দ্র মজুমদার শতবার্ষিকীর সময়ে সুকৃৎচন্দ্র-সুবীরচন্দ্র মজুমদারের কাছে তাঁদের বড়োদাদা সন্তোষচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র সরিৎচন্দ্র মজুমদারের একটি চিঠি দেখেছিলাম, রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির উত্তরে সেটি লেখা হয়েছিল। তরুণ সরিৎচন্দ্রের সেই চিঠি আমাকে বিস্মিত করেছিল, তখন তাঁর বয়স ছিল উনিশ। সেই চিঠি পড়ার স্মৃতি এবং রবীন্দ্রনাথের সে চিঠির উত্তর কোনোটাই আমার মন থেকে হারায়নি। সন্তোষচন্দ্রের জমি প্রসঙ্গে সেই চিঠিগুলি এই গ্রন্থে ব্যবহার করবার সুযোগ পেলাম। এই সঙ্গে কৃতজ্ঞচিত্তে যোগ করি, সরিৎচন্দ্র মজুমদারের পুত্র সুদীপ মজুমদার আমাদের প্রশ্নের উত্তরে কয়েকটি প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন। সুকৃৎচন্দ্র মজুমদারের কন্যা ডা. সুচিত্রা মজুমদার সরিৎচন্দ্রের রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিটির এবং তদুত্তরে রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি ছোটো চিঠির প্রতিলিপি আমাদের দিয়েছেন। এর ফলে এই পত্রগুচ্ছ সম্পূর্ণতা পেয়েছে। সরিৎচন্দ্রের বিবাহ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদী কবিতার প্রতিলিপিও মজুমদার পরিবারের সূত্রে পাওয়া গেছে। তাঁর পেশাগত ব্যস্ততা সত্ত্বেও ডা. মজুমদার নানা সময়ে তাঁদের পরিবার সম্পর্কে আমাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বাধিত করেছেন। সুবীরচন্দ্র মজুমদারের পুত্র সিদ্ধার্থ মজুমদার আমাদের অনুরোধে শান্তিনিকেতনে সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের জমি সংক্রান্ত

কিছু দলিলপত্রের প্রতিলিপি দিয়েছেন। জমিজমা বিষয়ক কোনো আলোচনায় প্রবেশের চেষ্টা আমরা করব না, তবে রবীন্দ্রনাথ-সরিৎচন্দ্র চিঠিপত্রের সঙ্গে এইসব আইনি কাগজপত্রের উপস্থাপন অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

সর্বোপরি উল্লেখ করি সুবীরবাবুর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুমনা সেনের নাম। অনেকদিন আগে থেকেই চিনতাম তাঁকে, তখন তিনি বিশ্বভারতীর ছাত্রী। এও জানা হয়েছিল তাঁর এইচ. পিডি থিসিসের বিষয় ছিল 'শ্রীশচন্দ্র মজুমদার'। অথচ তাঁরই সঙ্গে যোগাযোগ হল সবচেয়ে দেরিতে। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বংশলতিকা সযত্নে প্রস্তুত করে দিয়েছেন, এটি অত্যন্ত মূল্যবান কাজ হয়েছে। সন্তোষচন্দ্রের পুত্রদের জন্ম ও মৃত্যুর সময়কালও তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি। তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছি না, অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আর একটি বিষয়ে তাঁর কাছে আমি ঋণী। সন্তোষচন্দ্রের স্ত্রী শৈলবালা দেবী সম্পর্কে বিশেষ কিছু তথ্য পাইনি, অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের *মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থে শৈলবালা দেবীর নিজের একটু স্মৃতিচারণ আছে, এইটুকুই সম্বল ছিল। সম্প্রতি শ্রেয়সী পত্রিকায় সুবীরচন্দ্র মজুমদারের স্ত্রী শ্রীমতী পূর্ণিমা মজুমদার তাঁর শাশুড়ি মা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। কল্যাণীয়া সুমনার কাছে তাঁর মায়ের লেখা প্রবন্ধটির সন্ধান পাই, তাঁর সৌজন্যে প্রবন্ধটি হাতে পেয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব মিটেছে। এইটুকুই পেতে চেয়েছিলাম।

উল্লেখ্য, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের পূর্ববর্তী কয়েক প্রজন্মের পরিচয় যুক্ত হবার ফলে শ্রীমতী সুমনা সেন-কৃত শ্রীশচন্দ্রের বংশ লতিকাটি সম্পূর্ণতর হবার অবকাশ পেয়েছে। এই পূর্ববর্তী অংশের বংশলতিকা প্রণয়নের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন ডা: দেবাশিস বসু। তাঁর পরিচয় দেওয়া বাহুল্য। তিনি কলকাতা শহরের ইতিহাসবিদ এবং বঙ্গীয় পরিবারগুলির বংশক্রমানুগত বিপুল তথ্যের ভাণ্ডারী। ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনের সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে নয়। অভীকের বন্ধু তিনি, সতত সস্নেহে তাঁর মঙ্গলকামনা করি। নিজের গবেষণা ও অন্য কাজের ফাঁকে শ্রীঅভীককুমার দে এই বইয়ের অঙ্গ বিন্যাস ও প্রুফ সংশোধন করেছেন, ছবি ও রবীন্দ্র-পত্রের চিত্র-প্রতিলিপিগুলি তাঁর সংগ্রহভাণ্ডার থেকে আহৃত। মুশকিল আসান তিনি আমার, এইটুকু স্নিগ্ধ স্বীকৃতি রইল তার।

মহালয়া ১৪২১ প্রণতি মুখোপাধ্যায়

সূচিপত্র

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার : একটি জীবন	২১
বংশলতিকা	৬৩
রবীন্দ্র পত্রগুচ্ছ	৬৯
সন্তোষচন্দ্রের কয়েকটি চিঠি	১৩৪
শোকে ও স্মরণে	১৭৩
সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের জমি	১৯১
রমা কবির সৃষ্টিলীলা প্রাঙ্গণে সুরলোকের দূতী	২০৩
তথ্যপঞ্জী : সন্তোষচন্দ্র মজুমদার একটি জীবন	২২৭
: রবীন্দ্র-পত্রগুচ্ছ	২৬৩
: রমা কবির সৃষ্টিলীলা প্রাঙ্গণে সুরলোকের দূতী	৩৩৮
সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা	৩৪৫

সন্তোষচন্দ্র মজুমদার : একটি জীবন

জীবনের পথে চলতে চলতে কোনো মানুষই তার সব পরিচিত মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ধরে রাখতে পারে না। আত্মীয়ের আত্মীয়তাও উত্তাপ হারায়, অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের বন্ধনও শিথিল হয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ২ জুলাই ১৯২৭ তারিখের চিঠিতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন: 'জানি না, কি কারণে সংসারে আমার বন্ধুত্বের সীমা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। আমার মধ্যে একটা কোনো গুরুতর অভাব নিশ্চয়ই আছে। আমার বিশ্বাস, সেই অভাবটা হচ্ছে, আমার হৃদ্যতা প্রকাশের প্রাচুর্য্যের অভাব।' তাঁর বন্ধুত্বের সংকীর্ণ সীমার কথাটা একেবারে অমূলক নয়। এই বিশাল জীবন জুড়ে কত অজস্র বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠল, মাঝপথে বিশ্লিষ্টও হয়ে গেল বা কত। কেউ বা মুখ ফিরিয়ে নিলেন, প্রকাশ্যে বিরোধিতা বা সমালোচনা করতেও উৎসাহিত হলেন কেউ বা। তবে কবি বা ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের জীবনে অনুরাগীজনের অভাব কখনও ছিল না। আর প্রথম যৌবনে অন্তরঙ্গ বন্ধু যাঁরা ছিলেন— জগদীশচন্দ্র বসু প্রিয়নাথ সেন শ্রীশচন্দ্র মজুমদার,[১]— চিঠিপত্রে প্রমাণ যেটুকু নজরে পড়ে তাঁদের প্রতি 'হৃদ্যতা প্রকাশের প্রাচুর্যের অভাব' তো কই দেখি না। শ্রীশচন্দ্রের কথাটা বলি, সেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও সাহিত্যিক বন্ধু রবীন্দ্রনাথের; — তরুণ বয়সে যাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে আড্ডা জমত ভালোই। হয়তো কখনও বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে একসঙ্গে গেছেন, কিংবা দেখা হয়েছে সাবিত্রী লাইব্রেরিতে বা আর কোনো আলোচনা সভায়। সেই বন্ধু, যাঁর বিহনে রবীন্দ্রনাথ কবিতায় চিঠি লেখেন: 'শাম্‌লা আঁটিয়া নিত্য/তুমি কর ডেপুটিত্ব,/একা প'ড়ে মোর চিত্ত/করে ছট্‌ফট্' আর পরিপূর্ণ বর্ষাদিনে যাঁকে জোড়াসাঁকো বাড়ির নিজস্ব ঘরটিতে আড্ডার আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেন: 'লয়ে দাড়ি লয়ে হাসি/অবতীর্ণ হও আসি'— তাঁরও সঙ্গে একদিন চিরবিচ্ছেদের সীমানা টেনে দিয়েছিল মৃত্যু। মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে শ্রীশচন্দ্র ১৯০৮ সালে ৮ নভেম্বর প্রয়াত হলেন। কিন্তু তার অনেক আগে থেকেই এই বন্ধুর পরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁর জীবনের দুঃখ-শোক উদ্‌বেগে শ্রীশচন্দ্রের মনও উদাসীন থাকেনি।

শ্রীশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদার। ২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬ কলকাতায় তাঁর জন্ম। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতার চেয়ে কয়েক মাসের বড়ো হবেন। রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর ভার নিলেন, তাঁর বয়স ষোলো। পাঁচটি মাত্র ছেলেকে নিয়ে ১৯০১ সালে (৭ পৌষ ১৩০৮) শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সূচনা হবার কদিন পরেই মাঘ মাসে শান্তিনিকেতনে এলেন সন্তোষচন্দ্র। মীরা দেবীর স্মৃতিকথায় তাঁর যে পরিচয় আছে তা এইরকম: 'সন্তোষদার কথা বিশেষভাবে মনে আছে, লম্বা চওড়া গৌরবর্ণ, বেশ চোখে পড়বার মতো চেহারা।

তারপরে তিনি আমাদের ঘরের ছেলের মতো হয়ে যান।' আর রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর[২] লিখেছেন: 'বাবার অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের বড়ো ছেলে সন্তোষ আমার সহপাঠী হয়ে ভর্তি হল। তখন আমরা দুজনে ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ছি।' এই বছরটাই কেবল হাতে ছিল, শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে যাতে পরের বছরে (১৯০৩ সালে) রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে এনট্রেন্স পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে পারেন সন্তোষ, সেটাই অভিভাবকদের লক্ষ ছিল। শান্তিনিকেতনে আসবার আগে হয়তো উপযুক্ত প্রস্তুতির অভাবে সন্তোষচন্দ্র প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারেননি বা দিয়ে অকৃতকার্য হয়েছিলেন। সন্তোষ শান্তিনিকেতনে কেমন পড়াশোনা করছেন সে প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'আশা করি এবার সে পাশ হতে পারবে'। শ্রীশচন্দ্রকে লেখা তাঁর কয়েকটি চিঠির অংশ সন্তোষচন্দ্রের প্রস্তুতিপর্বের একটু হদিস দেয়:

> আমার মতে রথী সন্তোষ এবং ভোলা[৩] তিনজনকেই এবার বোলপুরে পাঠিয়ে দেওয়া ভাল। তোমাদের ওখানে যখন প্লেগের একটা আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তখন আর কাজ কি। এতদিন বোলপুরে ছিলুম— এখন বোলপুর ভারী রমণীয় হয়েছে— বেশ ঠাণ্ডা — শরীরের পক্ষে ভাল। রথী এবং সন্তোষ আপাতত কুঠিবাড়িতেই থাকবে— বিদ্যালয়ে তাদের থাকবার দরকার নেই। সেখানে তাদের পড়াশুনোর সমস্ত ব্যবস্থা করে দেব।

পরে আবার জানালেন 'সন্তোষ এখানে পড়িতেছে। দেখিলাম সে প্রায় সকল বিষয়েই কাঁচা কেবল তাহার ইংরাজিটা ভালো। বোধহয় নানা স্কুলে সঞ্চরণ করিয়া তাহার এই দশা হইয়াছে। এখানে যথাসম্ভব তাহাকে গড়িয়া পিটিয়া লইতে চেষ্টা করা যাইতেছে। রথীর সঙ্গে তাহার বেশ জমিয়া গেছে।' অনুমান করি, পিতার বদলির কারণে সন্তোষচন্দ্রকে বারবার স্কুল বদল করতে হয়। তার ফল ভালো হয়নি, লেখাপড়ায় অবহেলাও করেছিলেন হয়তো। ক্রমে পড়াশোনায় উন্নতির খবরটা বেশ আশাব্যঞ্জক হয়ে উঠল, এবার যেন সন্তোষ সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছেন রবীন্দ্রনাথ। রথীন্দ্রনাথের কথাও লিখছেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার পরে তাঁকে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য জাপানে পাঠাবেন ভাবছেন। বিজ্ঞানের কোনো এক বাস্তব-প্রয়োগ-সম্ভব বিভাগে তিনি শিক্ষিত হয়ে উঠুন, এই ইচ্ছা। সন্তোষচন্দ্রের ভবিষ্যৎ নিয়েও এইভাবেই ভাবতে চাইছিলেন:

> সন্তোষের পড়া ভালই চলচে। আশা করি এবার সে পাস হতে পারবে। তার সংস্কৃত এবং অঙ্ক কাঁচা আছে। সেইটে যদি ইতিমধ্যে আয়ত্ত করে নিতে পারে তা হলেই নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।
>
> এন্ট্রেন্স পাস করিয়েই রথীকে আমি জাপানে mining অথবা অন্য কোন practical বিষয় শিখতে পাঠাব। আমার উদ্দেশ্য এই যে, শিখে এসে সে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে ওই সকল বিষয়ে শিক্ষাদান করতে পারবে। সন্তোষকে পাঠাও না। বেশি খরচ নয়— মাসে ৬০্ টাকা মাত্র। তুমি যে কোন বিষয়ে তাকে পারদর্শী করতে চাও সেখানে তারই সুবিধা আছে। বুঝতেই পারচ বাঙালিদের চাকরি প্রভৃতি সমস্ত দুর্লভ হয়ে উঠেচে— ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়,—তেমন একটা কোন অর্থকরী শিল্পবিদ্যা না শিখতে পারলে উপায় নেই—

জাপানের পরিকল্পনাটা পরিত্যক্ত হয়েছিল। সন্তোষচন্দ্র সম্পর্কেও তাঁর পিতা প্রথমে বোধহয় মনস্থির করতে পারেননি। তিনি পাস করে কলকাতার কলেজে পড়বেন, সম্ভবত এমন একটা প্রস্তাবও ছিল। হাজারিবাগ থেকে লেখা একটা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে লিখতে দেখি: 'সন্তোষকে এফ এ-র জন্যে কোথায় দেবে? প্রেসিডেন্সি কলেজেই তাকে দিতে হবে ত? রথীর সম্বন্ধে আমার একটা ভাবনা রয়ে গেছে।'

কী সেই ভাবনা, এবারে আসব সে-কথায়। অভিভাবকদের প্রাথমিক দ্বিধা বা শৈথিল্য কেটে যেতে সন্তোষচন্দ্রও তার আওতায় এসেছিলেন। তাঁদের টেস্ট পরীক্ষার পরই মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়[৪] আশ্রম বিদ্যালয় ছেড়ে যান, কিন্তু রথীন্দ্রনাথ-সন্তোষচন্দ্রকে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য তৈরি করে দেবার বিষয়ে তাঁকেই সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯০৩ তিনি লেখেন:

> শ্রীমান রথীন্দ্র ও সন্তোষ এ বছর এন্ট্রেন্স দিতে পারিবে এরূপ আশার কোন কারণ ছিল না—আপনি রথীন্দ্রকে এক বৎসরে ও সন্তোষকে এই কয়েক মাসে এন্ট্রেন্স পরীক্ষার যেরূপ যোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন তাহা আমার পক্ষে আশাতীত—

রথীন্দ্রনাথ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন পরীক্ষায়, সন্তোষচন্দ্র দ্বিতীয় বিভাগে। সে বারের গরমের ছুটিতেও জনবিরল প্রখর গ্রীষ্মতাপিত শান্তিনিকেতনেই তাঁদের অবস্থান। তাঁরা তিনজন— রথীন্দ্রনাথ সন্তোষচন্দ্র আর দিনেন্দ্রনাথ[৫] শিক্ষক-অভিভাবক সতীশচন্দ্র রায়ের[৬] দায়িত্বে বেশ আনন্দে ছিলেন। বয়সের হিসেবে সতীশচন্দ্র সামান্যই বড়ো তাঁদের চেয়ে। প্রথাগত স্কুল শিক্ষা দিতে চাননি রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতনে তিনি একটি প্রকৃতিসন্নিহিত জীবনযাপনের শান্ত সহজ পরিবেশ রচনা করতে চেয়েছিলেন। প্রতিদিনের অধ্যয়ন-গান-অভিনয়-খেলাধুলো-উৎসব-উপাসনার ভিতর দিয়ে সুকুমার প্রাণগুলি বিকশিত হবে। আলো-হাওয়া রোদ-জলের দাক্ষিণ্য পেয়ে চারাগাছ যেমন অনুকূল পরিবেশে আপন রসদ সংগ্রহ করে নেয়, বড়ো হয়ে ওঠে, ছেলেরাও তেমনি বেড়ে উঠবে। গড়ে-পিটে মানুষ করে তোলার দিকে নজর দিতে চাননি রবীন্দ্রনাথ, হয়ে ওঠার উপর জোর দিয়েছিলেন। এই কাজের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য শিক্ষক মনকেও উদ্দীপিত সংগঠিত করে তোলার প্রয়োজন হত। এ কাজে রবীন্দ্রনাথ অজস্র সময় ও মনোযোগ ব্যয় করতেন। শুধু সেই গোড়ার দিনগুলিতে নয়, পরেও বারবার এ সব কথা বলতেন। পরে সন্তোষচন্দ্র যখন এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়েছেন, তাঁকেও লিখেছেন নিজের ভাবনা ও পরিকল্পনার নানা প্রসঙ্গে। একেবারে সেই প্রারম্ভিক দিনগুলিতে সতীশচন্দ্র রায়ের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ-কাঙ্ক্ষিত সেই আবহসৃষ্টির অনায়াস শক্তি লক্ষ করা গিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের জীবন তখন নানা বিপত্তি ও বিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে চলেছিল। বিশেষ করে স্ত্রী মৃণালিনী দেবী ও কন্যা রেণুকার অসুস্থতা ও মৃত্যু তাঁকে দীর্ঘসময় শান্তিনিকেতন থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করেছে। চিঠির পর চিঠিতে বিদ্যালয়-কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন, নির্দেশ পাঠিয়েছেন। শিক্ষক ও কর্মাধ্যক্ষের নিয়োগগত সিদ্ধান্তে বারবার তাঁকে অপরিহার্য

পরিবর্তন করতে হয়েছে। অসুস্থ কন্যাকে নিয়ে আলমোড়ায় আছেন যখন, ১০ জ্যৈষ্ঠ ১৩১০ (২৪ মে ১৯০৩) মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছেন: 'আপাতত শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে চারজন শিক্ষক আছেন। আরও তিনজনের আসিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি।... আপাতত এই কয়জন হইলে রথীকে শেখানো ও বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহ চলিয়া যাইবে। রথীর ছয়মাসের পাঠ্য আমরা স্থির করিয়া পাঠাইয়াছি। ছয় মাস হইয়া গেলে তাহার রীতিমত পরীক্ষা হইবে।' মাসখানেক আগে আর এক চিঠিতে তাঁকেই তিনি জানান : 'রথী মজঃফরপুর হইতে বোলপুরে আসিয়াছে, এখানে তাহার পড়াশুনার সুব্যবস্থা করিয়া দেওয়া গেছে। ডিগ্রির প্রতি লোভ পরিত্যাগ করিয়াছি— রথীর যাহাতে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় সেই দিকেই দৃষ্টি রাখা যাইতেছে।' তখন প্রাক্ আলমোড়াপর্বে রেণুকা হাজারিবাগে, রবীন্দ্রনাথ কয়েকদিনের জন্য বোলপুরে এসেছিলেন, এই চিঠি সেখান থেকে লেখেন। প্রথম কিছুদিন বোধহয় সন্তোষচন্দ্র অনুপস্থিত ছিলেন, পরে তিনিও যোগ দেন। সম্ভবত একই শিক্ষাক্রম তাঁর জন্যও নির্দিষ্ট হয়। এমনি করেই তাঁদের আরও দু-আড়াই বছর কেটেছিল। তারপর ১৯০৬ সালের গোড়ার দিকে তাঁরা দুই ছাত্র আমেরিকার উদ্দেশে রওনা হন।

১৯০৪ সালের শুরুতে শীতের ছুটিতে রবীন্দ্রনাথ ছেলেমেয়েদের নিয়ে শিলাইদহে, সন্তোষচন্দ্রও আছেন তাঁদের সঙ্গে। এই ছুটির মধ্যেই শান্তিনিকেতন আশ্রমে বসন্তরোগে সতীশচন্দ্রের মৃত্যু। ছুটির পরে তাই বিদ্যালয় শিলাইদহে স্থানান্তরিত হয়েছে, গ্রীষ্মাবকাশের পরে স্বস্থানে ফিরেছে আবার। এবার সন্তোষচন্দ্রের পরের ভাই সরোজচন্দ্র (ভোলা) ছাত্র হয়ে এলেন। আগস্ট মাসে মোহিতচন্দ্র সেনকে[৭] লেখা এক চিঠিতে নানা কথার মধ্যে চোখে পড়ে, রবীন্দ্রনাথ নির্দেশ দিচ্ছেন, শিক্ষকের সাময়িক অভাব মেটাতে রথী ও সন্তোষের দ্বারা যথাসম্ভব কাজ চালাবার ব্যবস্থা করতে। ছেলেদের মধ্যে কোনো চারিত্রিক কুঅভ্যাস যাতে সংক্রামিত না হয়, কখনও সেজন্যও সাবধান করেন, নজর রাখার কাজে দায়িত্ব দিতে বলেন সন্তোষচন্দ্রকে। এই মর্মে তিনি একটি চিঠিতে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখেছিলেন: 'তুমি সন্তোষকে লিখিয়া দিয়ো বিদ্যালয়ের ছাত্রদের চরিত্র আচরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে সেও যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখে।'

তিন আচার্য ব্রহ্মচর্য দীক্ষা[৮] দিয়েছিলেন তিন নির্বাচিত ছাত্রকে—ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল[৯] সরোজ চন্দ্রকে, মোহিতচন্দ্র সেন রথীন্দ্রনাথকে, রবীন্দ্রনাথ সন্তোষচন্দ্রকে। দীক্ষা দিন বা না দিন, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ সন্তোষচন্দ্রের আজীবনের ধ্রুবতারা একথা তাঁকে মুখে বলতে হয়নি, তাঁর সারা জীবনের আচরণ ও কর্ম তা প্রমাণ করেছে। তাবলে যে সাধনাশ্রমে তপস্বী হয়ে আছেন তা নয়। রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে একত্রে দেহে মনে গঠিত হয়ে উঠছেন, সাঁতারে কুস্তিতে সানো সানের[১০] কাছে জুজুৎসু শিক্ষায়। আবার যখন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষে তথ্য সংগ্রহ বা অনুবাদের কাজে শান্তিনিকেতনের ইস্কুলের ছাত্রদের সাহায্য পাবার প্রস্তাব করেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উত্তর দেন: 'আমাদের স্কুলে দুটি মাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত ছাত্র আছে[১১]— তাহাদিগকে আপনার নির্দ্দেশমত পরিষদের কাজে লাগাইয়া দিব।' ২৭ এপ্রিল

১৯০৫-এর এই চিঠিতে তিনি আরও জানিয়েছিলেন: 'অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত'[১২] এখানকার দুটি ছাত্র তর্জ্জমা করিতেছে— প্রায় শেষ হইয়াছে।'

বুদ্ধচরিত অনুবাদ করানোর ইচ্ছা মনে দানা বেঁধেছিল আগের বছর বোধগয়ায় গিয়ে। ১৯০৪ সালের অক্টোবরে বন্ধুবান্ধবের বেশ একটি বড়ো দলের সমাবেশ হয়েছিল সেখানে। গানে গল্পে বইপড়ায় ভ্রমণে বুদ্ধমন্দিরদর্শনে জমাট পরিবেশ।[১৩] তাঁবুর বন্দোবস্ত ইত্যাদি ব্যবস্থাপনার ভার পড়েছিল শ্রীশচন্দ্রের উপর। পিতার অসুস্থতার কারণে রবীন্দ্রনাথের যাওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা ছিল, অবশ্য শেষ পর্যন্ত যেতে পেরেছিলেন। প্রস্তুতিপর্বে শ্রীশচন্দ্রকে লিখেছিলেন: 'বুধগয়ায় আমার যাওয়া ঘটে কিনা সন্দেহস্থল। পিতার শরীর অত্যন্ত উদ্বেগজনক হয়ে উঠেছে। যাইহোক ছেলেদের নিয়ে তোমরা যেয়ো। সিষ্টার নিবেদিতার ও জগদীশের সংসর্গে ও আলাপ আলোচনায় তাদের বিশেষ উপকার প্রত্যাশা করচি। নিবেদিতা ওদের জন্যে উৎসুক হয়ে আছেন। তিনি ওদের দুজনের ইতিহাস শিক্ষার ভার নিয়েছেন— সেইজন্যে এই উপলক্ষ্যে তিনি ওদের সঙ্গে আলাপ করে নিতে চান। বুধগয়ায় বসে তিনি ওদের ইতিহাসচর্চ্চার ভূমিকাস্থাপন করে নিতে পারবেন।'[১৪] এই সময়ে শ্রীশচন্দ্র গিরিডিতে কর্মরত। বোধগয়ায় যাবার আগে-পরে কিছুদিন রথীন্দ্রনাথ সন্তোষচন্দ্র সেখানেও[১৫] থেকেছেন। ২০ কার্তিক ১৩১১ (৫ নভেম্বর ১৯০৪) শ্রীশচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের দৈনন্দিন পড়ার বিষয় সম্পর্কে বেশ বিস্তারিত করে লিখেছেন দেখতে পাই। মোহিতচন্দ্র সেন ওই মাসেই স্বাস্থ্যোদ্ধারমানসে গিরিডিতে আসছেন কয়েক মাসের জন্য, একথা জেনে ছেলেদের পড়াশোনার বিষয়ে আরও নিশ্চিন্ত বোধ করছিলেন। 'রথীরা আপাতত গিরিডিতেই রইল।' মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১১ নভেম্বর লিখলেন। আগের চিঠিতেই শ্রীশচন্দ্রকে জানিয়েছিলেন 'যে পর্যন্ত না ডেকে পাঠাই রথী সন্তোষদের তোমার কাছে রেখেই পড়িয়ো।' এই সাময়িক ব্যবস্থা বেশ কিছুকাল চলেছিল। 'ছেলেরা বর্ত্তমানে গিরিডিতে'— পরের বছর ২৬ আগস্টের চিঠিতেও লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

অনেকদিন থেকে গ্রাম সংস্কারের কথা ভেবেছেন রবীন্দ্রনাথ, নিজেদের জমিদারি এলাকায় ছোটো গণ্ডির মধ্যে নিজের সংকল্পকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন সাধ্যমতো। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে স্বদেশি সমাজ গড়বার, দেশকে সত্য অর্থে স্বদেশ করে তোলবার ডাক দিলেন। সে সব কথায় মনোযোগ দেবার, আত্মচেষ্টা জাগাবার, হাতে-কলমে গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচি সফল করার উদ্যোগ নেবার মেজাজ আন্দোলনের রাজনৈতিক নেতাদের ছিল না। উত্তেজনার বৃত্ত থেকে সরে গিয়ে ভিন্ন পথে রবীন্দ্রনাথের আত্মদ্যোগের চেষ্টা আর রথীন্দ্রনাথদের বিদেশে কৃষিবিদ্যা পড়তে পাঠানোর ব্যাপারে মনস্থির করার মধ্যে একটা বেশ মজবুত যোগসূত্র ছিল। রথীন্দ্রনাথ তাঁর *পিতৃস্মৃতিতে* সেই কথাই বলেছেন: 'তাঁর ধারণা হয়েছিল গ্রামের আর্থিক জীবনের মেরুদণ্ড কৃষির উন্নতি না করতে পারলে দেশের উন্নতি অসম্ভব। এইজন্য তিনি স্থির করলেন বিদেশে গিয়ে সন্তোষ ও আমি যদি ভালো করে কৃষি ও পশুপালন বিদ্যা আয়ত্ত করে আসি তা হলে ফিরে এসে আমরা তাঁর দেশের কাজে